পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ বিনোদন

প্রদ্যোত কুমার মাইতি

এক

স্বাধীনোত্তর যুগে গ্রাম-সমাজ কিছুটা আধুনিক শহর জীবনের প্রভবে প্রভাবান্বিত হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্দ্ধ পর্যন্ত গ্রাম - সমাজের মানুষদের বিনোদনে ক্ষেত্রে বাংলা তথা বাংলার অঞ্চল বিশেষের মাধ্যম ছিল পটচিত্র প্রদর্শন, সাপ খেলান, বাঁদর নাচান, পুতুল নাচ, যাত্রা কীর্তন ইত্যাদি। বর্তমান প্রবন্ধে আমি দীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার লোক - বিনোদন প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

দুই

গ্রামীন বিনোদন মাধ্যম সমূহ

১. পটচিত্র প্রদর্শন-

পটচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমটি যে বিনোদনের অঙ্গরূপে ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম প্রচারক বুদ্ধেদেবের সময় থেকে প্রচলিত ছিল তা অনুমান করা হয়েছে।[১] বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের পট বা পটচিত্রের উল্লেখ রয়েছে।[২] পট বা পটচিত্র যাঁরা সঙ্গীত সহযোগে দেখান, তাঁদের বলা হয় পটুয়া। এইসব পটুয়ারা জাতিতত্ত্বের বিচারে আধা হিন্দু, আধা মুসলমান।[৩] পট বা পটচিত্রের বর্ণনাজ্ঞাপক যে সকল সঙ্গীত গাওয়া হত, তা পটুয়ারা নিজেরাই রচনা করতেন।[৪] এই সব সঙ্গীত পটুয়া সঙ্গীত বা পটুয়া গান বলা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে পট সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে পট দেখাতেন এবং পয়সা বা চাল ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পেতেন। মেদিনীপুরের অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় পটুয়া পরিবারের বসতি বর্তমানেও অনেক রয়েছে।

পটগুলি ধর্মীয়, সামাজিক ও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে আঁকা হত এবং সেইমত গান রচনা করে গাইতেন। রামায়ণ - মহাভারতের কাহিনী, বেহুলা - লখিন্দরের কাহিনী, ধনপতি সদাগরের কাহিনী (কমলে - কামিনী), চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের ঘটনা। ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের ঘটনা, সামাজিক কাহিনী ইত্যাদি অবলম্বনে পট আঁকা হত এবং সেইমত গান রচনা করে গাওয়া হত। পটচিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে পটের বিষয়গুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল, ‘‘পৌরাণিক, প্রকৃতি ও স্থির চিত্র, ঐতিহাসিক বিষয় সম্বলিত, প্রতিদিনের ছবি এবং ব্যঙ্গচিত্র।’’[৬]

পটুয়ারা পট দেখিয়ে গান গেয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে লোকচিত্ত - বিনোদনের চেষ্টা করতেন। সেই সঙ্গে লোকশিক্ষাও অলক্ষে হয়ে যেত। অধিকাংশ নিরক্ষর গ্রামবাসী কাহিনীগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেতেন। বর্তমানে ভি. ডি. ও এবং টি. ভি. ইত্যাদির প্রচলনের ফলে পট প্রদর্শনের প্রথা যথেষ্ট পরিমানে কমে গেলেও একেবারে অপ্রচলিত হয় নি। পট দেখানোর সময় পটের বিষয়বস্তু অবলম্বনে যে সব সঙ্গীতের প্রচল ছিল তার নমুনা স্বরূপ কিছু কিছু সঙ্গীত এখানে তুলে ধরা হল।

হিন্দু মুললমান সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ বাংলাদেশের যে সত্যপীরের পুজোর উদ্ভব হয় তাকে কেন্দ্র করে পটুয়া সঙ্গীত রচিত হয়েছিল।

১. আর কোথায় আছ সত্যনারায়ন হইলাম স্মরণ
মোমার বিনা কেবা করে লজ্জা নির্বারণ
হিন্দুকুলে নারায়ণ মুসলিমকুলে পীর
দুই কুলে পাপ (?) খেয়ে হয়েছে জাহীর।
নামের নাই লেখাজোখা লম্বা লম্বা কেশ
নানা দিকে কত মুর্তি ধরে নানা বেশ।
নারায়ণ বলে আমি মর্ত্য নাম লব
আমার পূজা দেখে প্রচার করিব।
তমলুক’ (নিজস্ব সংগ্রহ)

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত পটুয়া সঙ্গীতটি গাওয়া হত—

২. এত শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া, কেশ নাহি বাঁধে
ধরিয়া স্বামীর পায়ে ফুকারিয়া কাঁদে।

তুমি মোর প্রাণনাথ, আমি তোমার স্ত্রী
আমারে ছাড়িয়া যাবে আর বল কি?
বৈরাগ্য হবে স্বামী এতই যদি মনে জান
তবে কেন পরের মেয়ে বিবাহ করি আন?
না করিনু রঙ্গরস, না করিনু খেলা
কেমনে সহিব আমি মদনের জ্বালা
এ নব যৌবন আমি কি দিয়ে রাখিব
স্বামী বিনে আমি কেমনে থাকিব।

তমলুক, (নিজস্ব সংগ্রহ)

বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হলে তাকে পটুয়া সঙ্গীতের আওতায় নিয়ে আসা হয়—

৩. বিয়ের আইন, বিয়ের আইন স্বাধীন দেশে হলো
সাত ছেলেরে মা বলে কিনা বিয়ে করি চলো।
বিধবা সে বলে হেসে বিয়ে করেছি কাল
স্বাধীন দেশের বিয়ের আইন এমনি হালচাল।

(নিজস্ব সংগ্রহ)

আবার দেশে কন্ট্রোল প্রথা চালু হলে পটুয়ারা গাইতে শুরু করে—

৪. মানের ব্যথা, বলতে কথা প্রাণটা কেঁদে ওঠে
স্বাধীনতার সঙ্গে বাবু কন্ট্রোল কেন জুটে।

তমলুক, (নিজস্ব সংগ্রহ)

অনুরুপভাবে ফ্যামিলি - প্ল্যানিং, মাইলোর গান ইত্যাদি এবং আঞ্চলিক কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করেও পটুয়ারা পট আঁকতেন এবং সেইমত গান রচনা করতেন। এইভাবে লোক বিনোদনের মাধ্যমে রূপে পট প্রদর্শন সমাজে প্রচলিত হয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে পটুয়ারা যখন কোন বিশেষ পট দেখাতেন তখন গানের মাধ্যমে পটের বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে ব্যখ্যা করতেন। দর্শক - শ্রোতারা এসব দেখে শুনে তৃপ্তি পেতেন। বিশেষ করে মহিলা ও বৃদ্ধ - বৃদ্ধারা এতই মুগ্ধ হতেন যে তারা পটুয়াদের পটগুলি পুনরায় দেখবার জন্য অনুরোধ জানাতেন এবং এরজন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বাবদ কিছু অর্থ বা সামগ্রী দিতেন। এইসব পটুয়ারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সুরেলা গানের মাধমে কাহিনীর বিবরণ দিতেন। সেই মুহূর্তে দর্শক - শ্রোতারা পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে যেতেন।[৭] তাই বলা হয়েছে ''Simplicity of thought and style, mural frankness and unsophistication are the very keynote of these ballads. These are neither sensual nor intellectual but strictly moral, i.e., agreeable to the moral nature of the common village folk. The Patuas more or less followed the style of medieval Bengali language and never at all that of the modern in composing these ballads.[৮] তাছাড়া এও বলা হয়েছে যে- ''পট সংগীত আমাদের বিলীয়মান লোকসংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। বাঙালীর প্রাণস্পন্দন এতে সবিশেষ স্পন্দিত। ...এজন্যই গুরুসদয় একে 'গণসমাজের চিত্র ও সংগীত বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই সমাজ - নিশ্চিতরূপে বাঙালীর নিজস্ব সমাজ'' [৯] এইভাবে পটুয়ারা পট দেখিয়ে এবং পটের প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত পরিবেশন করে লোক বিনোদনের চেষ্টা চালাতেন।

২. সাপ খেলানো

সাপুড়িয়ারা গ্রামাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাধারণত : দু - তিনটি ঝাঁপিতে (বেতের তৈরি) সাপ নিয়ে খেলা দেখাতেন। ঐ সময় সর্পদেবী মনসার উদ্দেশ্যে গান গাইতেন ঃ

সর্পদেবী মনসার চরণ বন্দিয়া—
দেখাব আমি সাপের খেলা।
দেবীর কৃপায় আমি ধন্য হয়ে আছি
কিছু অর্থলাভ করে প্রাণে বেঁচে আছি।
দেবী মোদের বড় অভিমানী
গ্রাম, নগরের বিনোদন
একটি ফুলের লাগি ছিল তাঁর অভিমান

তাই দুয়ারে লাগিয়া - দিব কুলের বাগান
ইত্যাদি

এরপর চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনী সংক্ষেপে গানের বর্ণনা সুরু করতেন। সর্পদেবী মনসাকে শিব - ভক্তা চাঁদ সদাগরের অবজ্ঞা, দেবী মনসার প্রতিশোধ গ্রহণ অর্থাৎ সর্পাঘাতে তাঁর সাতপুত্রকে মৃত্যু, অবশেষে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের স্ত্রী সতী বেহুলার, প্রচেষ্টায় দেবীর বরে সবপুত্রের প্রাণ লাভ ছিল এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। শেষ পর্যন্ত চাঁদ সদাগর দেবী মনসাকে পূজা দিতে বাধ্য হয়। সাপ - খেলানোর সময় সংক্ষেপে সাপুড়িয়ারা এই কাহিনী বিবৃত করতেন। তাই তাঁরা বলতেন - ''একটি ফুলে লাগি ছিল তাঁর অভিমান'' চাঁদ সদাগর- এর কাছ থেকে পূজা পাওয়ার আকাঙ্খা দেবীর মধ্যে প্রবল ছিল। সাপুড়িয়ারা জাতিতে শবর। সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে সাপুড়িয়াদের জীবিকা নির্বাহ করত। লোক - বিনোদনের এই প্রচেষ্টায় অনেক ঝুঁকি থাকলেও বংশ পরম্পরায় সাপুড়িয়ারা এই বৃত্তি অনুসরণ করে চলতেন। সেই সঙ্গে এরা ঝাড়ফুঁক (সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে) করতেন। সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা গৃহে বিষধর সাপ নিজেই এঁরা খেলা দেখাতেন।

৩. বানর - নাচন

শবর জাতির মানুষদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রচেষ্টা হল বানর খেলা দেখান। বানরকে প্রশিক্ষণ দান করে তাকে নিয়ে বানর - নাচিয়ারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অথবা হাটে - বাজারে বানর - নাচ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করতেন। বানর - নাচ দেখানর সময় বানর - নাচিয়ারা নানা রকম গান গাইতেন।

কেমন করে নাচনা ওরে
ধীরে ধীরে নাচনা ওরে।
কেমন করে চৌকিদারী
কেমন করে চৌকিদারী ছিল রে?
কেমন করে চোর চালানী
কেমন করে চোরের শাসন দেখা ওরে।

অর্থাৎ তুমি কেমন করে নাচ তা আস্তে আস্তে নেচে শিক্ষাপ্রাপ্ত বানর নির্দেশ পাওয়া মাত্র তা দেখাতে দেখাও শুরু করে। আবার বলা হয়, চৌকিদারে কেমন করে পাহারা দেয়? তখন বানর একটি ছোট লাঠি (কঞ্চি বলা হয়) কাঁধে নিয়ে হাটতে থাকে। এইভাবে বানর চৌকিদারের ভূমিকা পালন করে।

তারপর বানর - নাচিয়ে বলে - কিভাবে চোর চুরি করে তা দেখাও। বানর এই নির্দেশ পেলে চোরের চুরির কৌশল দেখায়। চোর ধপ পড়লে তাকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হয় তা দেখবার নির্দেশ পেলে বানড় দড়িতে বাঁধা একটি ছোট সামগ্রীকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ কি ভাবে ঢেকিতে ধান ভানা হয়? সঙ্গে সঙ্গে বানর তা দেখাতে শুরু করে। তারপর অসুস্থতার ভান করে শুয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ঃ তুমি কি তোমার শ্বশুর বাড়ি যাবে? বানর পূর্বের ন্যায় শুয়ে থাকে।

প্রশ্ন ঃ তুমি কি বাপের বাড়ি যাবে? সঙ্গে সঙ্গে বানর উঠে পড়ে এবং সম্মতিসূচক ভঙ্গী করে।

প্রশ্ন ঃ বাপের বাড়ি যেতে হলে খাল পেরতে হবে। কিভাবে তুমি পের হবে?

বানর - নাটিয়া বানরের সামনে একটি সরু লাঠি উঁচু করে ধরে, বানর তা লাভ দিয়ে ডিঙিয়ে যা— এইভাবে তিন চারবার দেখান হয়। এইসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত বানর বহু রকম খেলা (করাসাজি) দেখাত যা শিশু, কিশোর ও উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দিত। সেই সঙ্গে বানর - নাচিয়া পয়সা, চাল ও অন্যান্য সামগ্রী পেত। গ্রামীণ আনন্দ বিনোদনের এই মাধ্যমটি আজও আলোচ্য অঞ্চলে প্রচলিত।

৪. পুতুল নাচ

আনন্দ বিনোদনের একটি শক্তিশালী বাহন রূপে পশ্চিমবাংলার বহু জেলায় পুতুল নাচ এখনও প্রচলিত। পৃথিবীর বহু দেশে পুতুল নিয়ে - নাচানোর প্রথা অতি সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।[১০] প্রাচীন সংস্কৃতি সাহিত্যে এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পুতুল নাচের উল্লেখ রয়েছে।[১১] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কবিদের লেখা থেকে বোঝা যায় যে পুতুল নাচ বাংলাদেশে মধ্যযুগেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বাংলাদেশের পুতুলনাচের জন্য তিন ধরনের পুতুল ব্যবহৃত হত - (১) ডাঙ্গের পুতুল (২) সুতোয় টানা পুতুল এবং (৩) দস্তানা পুতুল বা বেণি পুতুল (string Puppet)। প্রথম দু-ধরনের পুতুল নাচের প্রচল পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার কম বেশি থাকলেও দস্তানা বা বেণি পুতুলের প্রচলন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলাতেই সীমাবদ্ধ। আমাদের আলোচ্য জেলায় তিন ধরনের পুতুল নাচের প্রচল ন থাকলেও দস্তানা পুতুল নাচের প্রচলন সর্বাধিক।

সাধারণত: পুতুলনাচের দুটি শাখা — প্রথম শাখার অর্ন্তভুক্ত হল ডাঙ্গের পুতুল ও সুতোয় টানা পুতুল। এগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাত্রার জন্য রচিত পালাগান ভিত্তিক কাহিনী ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শাখার অর্ন্তভুক্ত হল দস্তানা পুতুল যে ক্ষেত্রে যাত্রাভিনয়ের জন্য রচিত পুস্তক ব্যবহৃত হয় না। এরা বাড়ি বাড়িঘুরে নাচ দেখান। পুতুলনাচের সময় দস্তানা পুতুল শিল্পীর দু-রকম গান করে থাকেন—পালাগান

ও তর্জা গান। উভয় গানই পরিবর্তনের ফলে সামাজিক বিষয়গুলিও দস্তানা পুতুল শিল্পীরা ব্যবহার করতে শুরু করেন। দু-হাতে দুটি পুতুল নিয়ে সাধারণত: একজন শিল্পীই পুতুল নাচ দেখান।

অপরদিকে ডাঙ্গের পুতুল এবং সূতোর টানা পুতুল নাচের পেশাদার দল রয়েছে। এই ধরনের পুতুল নাচের জন্য নির্দ্দিষ্ট মঞ্চের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের পুতুলনাচের জনপ্রিয়তা আলোচ্য জেলার যাত্রায় ন্যায় যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে যেমন এক ধরনের পুতুল নাচের প্রচলন রয়েছে তেমননি কোন শুভ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যথা বিবাহ, পৈতে মুখেভাত ইত্যাদিতে পুতুল নাচের ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আনন্দ বিনোদনের এই মাধ্যমটি গ্রাম বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং এ প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে "The popuularity of the puppet show is such that the male and female, child adn adult, highbrow and lowbrow, riich and poor all fail for its charms."[১২]

বাংলার লোকসংস্কৃতি অঙ্গীভূত পুতুলনাচ লোক - বিনোদন তথা লোক - শিক্ষার মাধ্যম রূপে, সুদীর্ঘকাল ধরে যে প্রবহমান, তা গ্রাম বাংলার জীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের অজানা নয়। আমাদের আলোচ্য জেলায় এখনও পুতুলনাচের বিশেষ করে দস্তানা বা বেণি পুতুলনাচের প্রচলন চোখে পড়ে।[১৩]

৫. যাত্রা

যাত্রা লোক বিনোদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন বূপে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত। ধর্মীয় বা ধর্ম নিরপেক্ষ কাহিনী অবলম্বনে প্রকাশ্য স্থানে বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে নরনারীগণ কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র সহকারে অভিনয় করাকে যাত্রা বলা হয়। যাত্রার উদ্ভব প্রসঙ্গে পি. গুহঠাকুরতা মন্তব্য করেছেন ঃ "The yatras of Bengal, as they exist today, are evidentlyy avery old type of popular play. They may possibly have lineally descended from similar dramatic representations and folk plays current in the earliest period of Hindu History or even in a period before recorded history begins."[১৪]

এ বিষয়ে পরবর্তীকালে বহু পণ্ডিত - গবেষক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে নাটক অভিনয়ের প্রথা বহু প্রাচীন। অতীতে যাত্রাভিনয় ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত দিল এবং মধ্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্যে নাটক, অভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে।[১৫] প্রথমদিকে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমস্থল ইত্যাদির ভক্তিমূলক ঘটনাবলী অবলম্বনে যাত্রাগান উদ্যাপিত হত। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের মহাত্ম্যসূচক কাহিনী অবলম্বনে যাত্রাগান এবং আরও কিছু পরে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে যাত্রাগান জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাছাড়া ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক পালাগানের পাশাপাশি ঐতিহাসিক পটভূমি অবলম্বনে যাত্রা অভিনীত হতে থাকে।[১৬]

অরিভক্ত বাংলার অন্যান্য অনেক লেজার ন্যায় পূর্ব মেদিনীপুরেবিভিন্ন ধরনের যাত্রাভিনয়ের পেশাদার দল ছিল। বর্তমানেও এই জেলায় ছোট বড় আঞ্চলিক যাত্রাভিনয়ের দল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর চিত্তবিনোদনের অঙ্গরূপে যাত্রাভিনয়ের প্রচল সমাজে প্রচলিত হয় এবং গ্রাম বাংলায় বিনোদনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে কাজ করত। বর্তমানেও তা একেবারে অপ্রচলিত হয়নি।

৬. কী র্ত ন

সাধারণভাবে কীর্ত বলতে ভগবদ্ বিষয়ক বোঝায় ও বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে যে সঙ্গীত তাকেই কীর্তন নামে অভিহিত করা হয়।[১৭] অনুমান করা হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ জয়দেবের সময় থেকে বাংলাদেশে কীর্তনের প্রবাহ এসেছে।[১৮] ঐ সময় সংস্কৃত ভাষায় কীর্তনের ধারা প্রচলিত ছিল এবং উদাহরণ হল জয়দেবের গীতগোবিন্দ।[১৯] তবে কীর্তনের জনপ্রিয়তা শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম প্রচার করলেন তার একটি প্রধান বাহন হল কীর্তন।[২০] বাংলাদেশে প্রচলিত কীর্তন দুভাগে বিভক্ত — (১) নামকীর্তন ও (২) লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। নামকীর্তনে ভগবানের নাম গীত হয়। এই কীর্তনে যেমন ভগবানের নাম সুর মহাযোগে গাওয়া হয় তেমনি সেই সঙ্গে প্রার্থনা ও দৈন্য নিবেদনও গাওয়া হত। অপরদিকে লীলাকীর্তন হল শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করে যে সকল গান গাওয়া হত। কীর্তনগান ধর্মীয় প্রেরণা সঞ্জাত হলেও গ্রাম - জীবনে বিনোদনের অঙ্গরূপেও বিবেচিত হতে পারে।

আলোচ্য জেলায় বৈষ্ণবধর্ম তথা কীর্তনের বিশেষ প্রভাব আজও চোখে পড়ে। মহোৎসব ও কীর্তনগানে জেলাবাসীর জনজীবন মুখরিত হত। এই জেলায় বহু কীর্তনের দল রয়েছে। জেলাবাসীর বয়স্ক স্ত্রী - পুরুষের কাছে কীর্তন গান ভক্তির পাশাপাশি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে আজও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। সেই সঙ্গে কীর্তনের প্রভাবে জনগণ এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভেরও সুযোগ পেতেন।

৭. স্ত্রী আচার অনুষ্ঠান

গ্রাম বাংলায় প্রচলিত স্ত্রী আচারগুলি যেমন সাধভক্ষণ, সন্তানের জন্ম, অন্নপ্রাশন ও বিবাহ - কেন্দ্রিক একই সঙ্গে ধর্মাচরণ এবং বিনোদনের অঙ্গরূপে বিবেচিত হত তাও আমাদের অজানা নয়।[২১] কারণ এইসব আচার অনুষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না — এই ব্যাপ্তি ছিল পরিবারের বাইরেও। এমনকি এতগুলি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েও একই উদ্দেশ্য পূরণ হত। কারণ নারী - সমাজ এতগুলি উদ্‌যাপন করত হাসি - গল্প ঠাট্টার মধ্য দিয়ে। চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকা গ্রাম্য নারীরা ঐ সময় নিজেদের মধ্যে গল্প - গুজবের সুযোগের মধ্য দিয়ে বিনোদনের সুযোগ পেত। তাই আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে এইসব আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে থাকত প্রবল আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। পুরুষময় জগৎ থেকে একটু অবসর, এ ছিল তাদের নিজস্ব জগৎ - যার রাজা প্রজা সবাই মহিলা।[২২]

।।তিন।।

গ্রাম - সমাজ এখন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবে গ্রামীণ বিনোদন মাধ্যমগুলি বহুলাংশে গ্রাম - সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই অতীতের গ্রামীণ বিনোদন মাধ্যমগুলির স্থলে আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থা স্থান করে নিতে চলেছে। অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ বিনোদনের মাধ্যমগুলি জনপ্রিয়তা হারালেও একথা অনস্বীকার্য যে গত শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত লোক - বিনোদনের আলোচ্য মাধ্যমগুলি গ্রামীণ সমাজকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। পূর্ব মেদিনীপুরের গ্রামসমাজে আজও এই মাধ্যমগুলি একেবারে অপ্রচলিত নয়, যদিও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণ হারিয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১। ইন্ডিয়ান ফোকলোর, ভলিউম ওয়ান, নং ওয়ান, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬০

২। প্রদ্যোত কুমার মাইতি, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পরিবেশক, পুস্তক বিপনি, কলিকাতা, পৃ. ৮০, ৯০।

৩। ভোলানাথ ভট্টাচার্য, ‘‘ভট ও পটুয়া এবং আমরা’’, অম্বিষ্ট (সাহিত্য, সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক), পট সংকলন, কলিকাতা, জুলাই, ১৯৭০, পৃ. ৩৬,।

৪। মাইতি, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৮১।

৫। তদেব, পৃ. ৯৬।

৬। বারিদবরণ ঘোষ, পট, পটুয়া পটগীতি, বিশ্ববিদ্যা পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৫।

৭। মাইতি, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৮২।

৮। ইন্ডিয়ান ফোকলোর, ভলিউম ওয়ান, পৃ. ৬৮।

৯। ঘোষ, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭

৯। (ক) হিমাংশুমোহন রায়, শবর : দ্যা স্নেকচার্মার, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৮ - ৫৫, ১০।

১০। মাইতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ - ৮৪।

১১। তদেব।

১২। জন বুসেল, দ্যা পাপিট থীয়্যাটার, লন্ডন, ১৯৪৬, পৃ. ১৬।

১৩। মাইতি, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮৪ - ৮৬।

১৪। পি. গুহঠাকুরতা, দ্যা বেঙ্গলি ড্রামা - ইটস্ অরিজিন অ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট, লন্ডল, ১৯৩০, পৃ. ১।

১৫। মাইচি, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পৃ. ৮৩।

১৬। তাদেব, পৃ. ৮৩ - ৮৪।

১৭। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কীর্তন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বাং, সন ১৩৫২, পৃ. ৫।

১৮। তবেদ, পৃ. ১৮; রীনা দত্ত, বাঙলার কীর্তন য় লোকসঙ্গীত, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলিকাত, ১৯৯৬, পৃ. ৫৩।

১৯। রীনা দত্ত, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৩।

২০। মিত্র, কীর্তন, পৃ. ২০।

২১। প্রদ্যোত কুমার মাইতি, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, পরিবেশে- দে বুক স্টোর, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৭১ - ১৯০

২২। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা, শনিবার, ২৬শে জুলাই, ২০০৮, পুস্তক পরিচয়, পৃ. ১৪ দ্রষ্টব্য।